OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 460 - 470
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সময়ের ছায়াপথে জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে : কবিতায় চিত্রকল্পের প্রয়োগ ও চিত্রশিল্পের প্রভাব

সঞ্চারী ভৌমিক
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sancharibhowmik33@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Jibanananda Das, Bishnu Dey, Poetic imagery, Historical consciousness, Influence of colour, Modern poetry, Creative, Metaphor.

Abstract
Poetic imagery is quite popular throughout the history of world poetry. In the modern era, a turning point in Bengali poetry occurred during the 1930's. Starting from this period, poets extensively referred to imagery and art to garner a better understanding of their abstract ideas. Here we discuss how the two poets, Jibanananda Das and Bishnu Dey, successfully materialized their imaginative world by the contextual utilization of imagery and art, although with varied extents. Time consciousness has been identified as one of principal aspects of Jibanananda's poetry. His journey through time consciousness traverses the physical to the metaphysical realm. This journey from beginning to eternity can be divided into three stages.The diversity of rural Bengal, together with folk and mythological elements such as the 'Mangalkabhya' largely influenced the use of imagery in Jibanananda's works. The poetic use of metaphors to aptly convey his imagination and thoughts allow his works to be interpreted freely by the readers from different societal backgrounds. Influences from surrealism to impressionism can also be seen upon a more critical observation. On the other hand, Bishnu Dey wanted to express wisdom in poetry. Bishnu Dey's poetry brings out aspects of nature from contemporary situations. Just as paintings are created by collecting materials from literature, literature may also be influenced by the idea and thoughts of a painter. In his poetry, Bishnu Dey portrays the visibility of colour and the influence of painters like Pablo Picasso and Paul Cezanne are clearly notable. However, both the poets gave us poetic fragrance and helped transform the vision of a poem according to the intellect of the modern reader. Therefore, it can be said that the use of imagery in poetry and the influence of painting are interrelated.

Discussion

এক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সময়ের ঘষা লেগে হয়তো শিলালিপি ক্ষয়ে যায় কিন্তু কবিতার প্রতিটা অক্ষর হাতে মশাল নিয়ে জ্বলজ্বল করে সাহিত্যের দরবারে। এককালে কবিতা ছিল গানের প্রজা। পদাবলীসহ বিভিন্ন কাব্য পরিবেশিত হত সুরের মাধ্যমে। যদিও তখন যে কোনো সাহিত্যকেই কাব্য বলা হত। বস্তুত যা ছিল গেয়-সাহিত্য। রাজ-রাজাড়াদের সভাতে সুরেলা আবৃত্তি করে তা পরিবেশিত হত। কিন্তু কবিতা মূলত পাঠকের কাছে এক নিভৃত পাঠ, নিবিষ্ট পাঠ যা পড়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক ছবি – যে ছবি মনের ভিতরে সৃষ্টি করে সূক্ষ্মবোধ। শব্দ দিয়ে মালা গাঁথতে গাঁথতে কবি জন্ম দেন তাঁর ক্যানভাসে এক ছবির। তাই কবিতায় চিত্রকল্প এবং চিত্রশিল্পের ভূমিকা থেকেই যায়। চিত্রকল্পই কবিতাকে পাঠকের মনের গভীরে আধিপত্য বিস্তার করতে যে বহুল ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে খুব একটা সংশয় প্রকাশের অবকাশ নেই। আবার রঙ–তুলিতে আঁকা ছবিও তো কবিতা হয়ে উঠেছে কোথাও কোথাও। তাই চিত্রশিল্পে, চিত্রশিল্পীর প্রভাবও কবিতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। চিত্রশিল্পী যেমন কোনো ক্ষেত্রে সাহিত্য– কবিতা দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন – তেমনই কবি ও নিজের ক্যানভাসে চিত্রশিল্প এবং শিল্পীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জন্ম দিয়েছেন শব্দের ছবি। কবিতার চিত্র। বাংলা কবিতায় যে অসীম রত্নভাণ্ডার রয়েছে তাতে খুঁজলে কবিতায় চিত্রকল্প ও চিত্রশিল্পের মনি-মুক্ত খুঁজে পাওয়া খুব একটা অসম্ভব নয়। এই আলোচনার মূল বিষয় হল বাংলা কবিতায় চিত্রকল্পের প্রয়োগ এবং চিত্রশিল্পের প্রভাব।

অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে অ্যারিস্টটলের গুরু প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল দুইজনেই শিল্পকে অনুকরণ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রভেদ হল এই যে প্লেটো বলেছেন শিল্প তথা সাহিত্য সত্যের ছায়ার ছায়া এবং কবিরা মিথ্যাচারী তাই আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের নির্বাসিত করা উচিত। এই অভিমতের বিরোধিতায় অ্যারিস্টটল বলেন অনুকরণ হলেও শিল্প বা সাহিত্য আসলে পূরণকারক সত্য। কবি তো মিথ্যাচারী নন বটেই বরং তিনি দ্রষ্টা, যিনি ইতিহাসের তথ্যের মধ্যেকার অসম্পূর্ণতা গুলো, তাঁর দৃষ্টির দর্শণের মধ্যে (কল্পনার মানসী) দিয়ে পূরণ করেন।

অ্যারিস্টটল 'অনুকরন'-এর মধ্যে তিনটে জিনিস দেখিয়েছেন – ১। বিষয়
২। মাধ্যম
৩। পদ্ধতি

এই আলোচনায় মাধ্যম হিসেবে সাহিত্য সংরূপ কবিতা এবং বিষয়ের দিক থেকে কবিতার চিত্রকল্পের যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা এবং তা করতে গিয়ে সংহত হবার প্রয়োজনে চিত্রকল্পের জন্ম। একজন কবির স্মৃতিলোক বা তার অভিজ্ঞতার জগতকেই পাঠক তাঁর শিল্পকর্মের দ্বারা অনুভব করে থাকে। অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতির মেলবন্ধনে কবির সৃষ্টি, তাঁর কবিতা আরও বেশি করে প্রাণবন্ত এবং উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পাঠক মহলের দরবারে। স্মৃতি, জীবনের অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ এইসবের প্রেরণায় কবির কল্পনালোক সৃষ্টি করে চিত্রকল্পের কুঞ্জবনকে। অনুভূতির পুষ্পমালা বিকশিত হয় কবিতায়, কবিতার চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে। তাই কবির প্রতিটি চিত্রকল্প কবির অভিজ্ঞতার নিদর্শন। জীবন এবং জগতকে তিনি যে ভালোবাসার এবং অনুভবের অনন্যমূল্যকে উপলব্ধি করার জন্যই কবিতায় ব্যবহৃত চিত্রকল্পের আলোচনার প্রয়োজন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা কবিতার কালান্তর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন –

> "রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বড় কবিদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার আকার এবং প্রকার, বিপুল এবং জটিল বলেই তার প্রকাশের বহুধা কষ্টসাধ্য। তথাপি এ পথেয় কষ্টভারও পদে পদে কবি– কীর্তির প্রসাদেই লাঘব হয় বলে, পথের প্রলোভন কখনও হ্রস্ব নয়।"[১]

স্মৃতির কাজই হল অনুষঙ্গ– সৃজন। অনুষঙ্গ সৃজন ব্যাতিরেকে চিত্রকল্প গঠিত হয় না। কবির জীবনের অভিজ্ঞতাকে সূত্রবদ্ধ করতে চিত্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আবেগ এবং মননের সুসমঞ্জস সমন্বয়ের অনুকূল পরিবেশে অনুষঙ্গ সৃজন ক্রিয়ার স্বাধীনতা এবং স্বচ্ছন্দতা রয়েছে। শ্রেষ্ঠ কবিতা সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন –

> "শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনার প্রয়োজনীয় পূর্বাবস্থা তখনই গঠিত হয় যখন মন অব্যর্থ শৃঙ্খলায় শিল্পলক্ষ্য হয়ে নিজের সমগ্রতাকে বেঁধে ফেলতে পারে।"[২]

মনের অনুষঙ্গ সৃজনী – ক্ষমতার স্বাচ্ছন্দ্য এবং বলা যেতে পারে এই দ্বৈতে শ্রেষ্ঠ শিল্পের জন্ম হয়। মনের উপরিতল যখন একটা নির্দিষ্ট শিল্পলক্ষের দিকে কেন্দ্রীভূত, তখন অবচেতন মন নেপথ্যে ব্যস্ত অনুষঙ্গের পরম্পরা সৃজনের জন্যে। সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার এবং উপলব্ধি তাঁর চেতনার বিকাশকে উজ্জীবিত করেন। তাই চিত্রকল্পের আলোচনার ক্ষেত্রে এই কথাগুলি আবশ্যিক ভাবে এসে যায়। এবং বোঝা যায় শুধুমাত্র উদাহরণ সরবরাহ করা চিত্রকল্পের কাজ নয়। যেহেতু এটা সমগ্র মানসের সৃজনী ক্রিয়ার অনিবার্য প্রকাশ, তাই এর বিচারও হয় সেই দৃষ্টিকোণ থেকে। স্মৃতি, আবেগ এবং মুক্তি ন্যায়ের ত্রি-ধাতুতে কল্পনা গঠিত; তাই, মনের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই শক্তির যোগাযোগ এবং সহযোগ ঘতে কল্পনার সাহায্যে। সুতরাং, চিত্রকল্প কল্পনার বস্তুরূপায়ণ। জীবন সংক্রান্ত মনোভাবের পরিবর্তনে এই রূপায়ণের ও পরিবর্তন ধ্রুব।

সে কারণে প্রাচীন মহাকাব্যের কবিরা যখন সাদৃশ্য বিবৃত করতে গিয়ে উপমামূলক চিত্র রচনা করেছেন, তখন তাঁদের ব্যবহৃত উপমা রাশিতে আভাসিত হয়েছে জীবনের বহুধা বৈচিত্র।

> "সিংহ তুল্যগতি, নগেন্দ্র তুল্য বিক্রম, কাশ্মিরী তরুঙ্গমীর ন্যায় সুন্দর' – প্রভৃতি উপমা যখন প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল তখন এগুলি জীবন ও জগত সমন্ধে কবির বাস্তব আগ্রহকে ধারণ করেছিল, জীবনের ঐশ্বর্যের বিপুলতাকে ব্যক্ত করাই ছিল এদের কাজ।... সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে, অরণ্য জীবনের অকস্মাত সংস্পর্শে উদ্ভূত বিষয় অপেক্ষা, সার্বজনীন অরণ্য – স্মৃতিই মহাকাব্যের জুগের এবম্বিধ চিত্রকল্প সৃজনের মূলে।"[৩]

বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ের বা বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সুপ্রকাশ সাদৃশ্য রচনার ভিতর দিয়ে জীবনের বিশাল বিকল্প রচনার চিত্রপটকে কবি পূর্ণ করেন না। তাঁর লক্ষ বস্তুরূপের পরিভাষায় নিজের আত্মভাবনাকে ব্যক্ত করা। বিষয়ের আপাত সাদৃশ্যের প্রয়োগ একান্ত ভাবেই বহিরঙ্গ ব্যাপার। চিত্রকল্পের মাধ্যমে কবির অনুভূতিকে ব্যাখ্যার উপক্রম হিসাবে দেখা হয়। কী ভাবে দেখছেন, ভাবছেন, অনুভব করছেন, আধুনিক কবির কাছে চিত্রকল্প সেই তাৎপর্যের সন্ধান দেয়। তাই কবিতার সমগ্রতার টানে এর প্রস্ফুটন, আবার সেই প্রস্ফুটিত চিত্রকল্প তার বিনিময়ে কবিতার সমগ্রতাকেই সমৃদ্ধ করে। বাস্তবতার গভীরকে সন্ধান করাই এর উদ্দেশ্য।

> "তাই কীটস যখন পাঠকের কাছে রসসিদ্ধ কবিতার সার্থক চিত্রকল্পের প্রসঙ্গে তাকে সূর্যোদয় মধ্য সূর্যের কিরণ সম্পাত এবং অস্ত সূর্যের উত্তর গরিমার সঙ্গে উপমিত করেন তখন কবি মানসে চিত্রকল্প প্রস্ফুটনের ব্যাপারটা কতটা হৃদয়ঙ্গম হয়।"[৪]

প্রকৃত পক্ষকে কবির অভিজ্ঞতা কি আকারে রূপ গ্রহণ করে, কবি নিজে কী ভাবে ব্যাপারটাকে অনুভব করেছেন সেইটাই চিত্রকল্পের মূলে রয়েছে।

> "রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'রাত্রে ও প্রভাতে'র শেষ স্তবকে – 'দেবী তব সিঁথি মূলে লেখা নব অরুণ সিঁদুর রেখা। তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খ বলয় তরুণ ইন্দুলেখা' – এই চিত্রকল্পে শঙ্খবলয়ের আভাসের প্রসঙ্গে তরুণ ইন্দুলেখার কল্পনা বাংলা কাব্যধারায় বৈষ্ণব পদকারদের দৌলতে আমাদের সুপরিচিত। কিন্তু এই পূর্বপরিচিতির জন্য চিত্রকল্পটি পাঠকদের কাছে তার তাৎপর্য হারায় না।"[৫]

এর থেকেই বোঝা যায় সমগ্র কবিতায় মৌলভাব প্রেরণার আকর্ষণে চিত্রকল্পএর ভূমিকা রয়েছে। চিত্রকল্পের সার্থকতায় পাঠের পরিসমাপ্তিতেও মনে রয়ে যায় প্রভাব, যার আলকে কবিতা আরও বেশি করে আত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠে এবং সেটাই কবিতার উদ্দিষ্ট রস – লক্ষ্য।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দুই

জীবনানন্দ দাশ এমন একজন কবি যিনি শুধুমাত্র তাঁর সময়কালের বাঁধনে সীমাবদ্ধ নন, তাঁর কবিতা সেই মশাল হাতে নিয়ে যাত্রা করে সৃষ্টির আদি থেকে অনন্তের পথে। তাঁর যাত্রা সময়চেতনার থেকে মহাসময়চেতনার দিকে, যার ব্যাপ্তি কাল থেকে মহাকালের দিকে। শিল্পী যখন শিল্প সৃষ্টি করেন তখন তাঁকে জীবনের প্রবাহমান ধারা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। মানব সভ্যতার সেই অস্তিত্বের সন্ধান শিল্পের মধ্যে নিয়ত কাজ করে। জীবনানন্দ দাশের কবিতার দিকে তাকালে একটা যাত্রা লক্ষ করা যায়। সমকালের ক্ষয়ের দ্বারা পীড়িত, ব্যথিত কবি আশ্রয় নিতে গেছেন প্রেমের কাছে কিন্তু প্রেম তাঁকে শান্তি দেয়নি তখন তিনি আশ্রয় নিতে গেছেন মৃত্যুচেতনার কাছে। এই চেতনাবোধের শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে চিত্রকল্পের নির্মাণ।

"সব ভালোবাসা যার বোঝা হল, দেখুক সে মৃতুকে ভালোবাসে" কিন্তু মৃত্যুচেতনাও তাঁকে শেষ পর্যন্ত তৃপ্তি দিল না তখন তাঁর চূড়ান্ত গন্তব্য হয়ে দাঁড়াল মহাকাল চেতনা। জীবনানন্দ দাশের এই সময়চেতনাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে –

১. পরিপার্শ্বগত সময় চেতনা – যা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে। এই পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'রাত্রি', 'তিমির হননের গান', '১৯৪৬-৪৭' ইত্যাদি। 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের 'তিমির হননের গান' এবং 'রাত্রি' কবিতাটির সুর প্রায় এক যেখানে মহানগরীর রাত উঠে এসেছে কবির কলমে।'তিমির হননের গান' কবিতার প্রেক্ষাপটে রয়েছে ১৯৪২ সালের শেষ দিকের সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এবং ইংরেজদের 'পোড়া মাটি নীতি' যার ফলে হাজার হাজার গ্রামের নিরন্ন মানুষ মহানগরীতে ছুটে আস্তে বাধ্য হয় খাদ্যের জন্যে। কবি লেখেন –

"আরো বেশি কালো কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে –
ফুটপাথ থেকে দূর নিরুত্তর ফুতপাথে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা মরে যেতে জানে।"

কবি এই কবিতায় 'মধ্যবিত্তমদির জগতে'র কাছে একটা প্রশ্ন যা তাঁর আত্মজিজ্ঞসাও – 'আমরা কি তিমির বিলাসী?'

২. পরিপার্শ্বের অভিঘাতে তৈরি হওয়া আত্মগত সময়চেতনা – এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি হল 'বোধ', 'আটবছর আগের একদিন', 'শিকার' ইত্যাদি।

রক্তাক্ত মানবতার আর্তনাদ জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বোধ' কবিতায় যে তীব্র ভাবে এসেছে তা আর অন্য কোথাও আসে নি। কবি সমকালীন অস্থিরতার গভিরতর কেন্দ্রে প্রবেশ করেছিলেন। সময়ের ক্রান্তি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ক্রান্তির সঙ্গে একই বিন্দুতে মিলে গেছে। মানুষের জীবন থেকে যে সহজতা হারিয়ে যাচ্ছে সেই কাথা উঠে এসেছে। কবি এই কবিতায় লেখেন – 'সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে!' এবং 'হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল?' – এর মধ্যে সময়ের, সমাজ এবং জীবনের সঙ্গে কবির ব্যক্তিজীবনের জটিলতা এক হয়ে গাছে। একদিন যা সহজ ছিল ,সহজতা ছিল মানুষের মধ্যে তা বর্তমান সময়ে জটিল হয়ে গাছে। 'স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে' – স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে আগামী আর বোধের মধ্যে রয়েছে অতীত ও আগামী উভয়ই, এই 'বোধ' শান্তি দেয় না। কবিকে তাই লিখতে হয় –

"সকল লকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমি একা হতেছি আলাদা?'

৩. সময়চেতনার তৃতীয় পর্যায়ে দেখা যায় 'বড় আমি'র সময়চেতনাকে। চলে আসছে কালের নদীতে ভেসে যাওয়া সেই নৌকা ইতিহাস চেতনার কাছে। মানবের সময়চেতনার মূলবক্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে এখানে – ইতিহাস, ভূগোলের সীমানা পেরিয়ে সময়ের মানচিত্রকে ছাপিয়ে যাচ্ছে, 'বনলতা সেন' হল যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কবি এডগার অ্যালান পো এর 'হেলেন'-এর প্রতিচ্ছবি যার মধ্যে উঁকি মেরে যায়। প্রাচীন ও আধুনিকের মেলবন্ধন যেন কাঠামো গড়ে তোলে জীবনানন্দের কবিতার। যেখানে এক প্রেমিক হৃদয় এখানে হাজার বছর ধরে পথ হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যায় ইতিহাসের কাছে। সিংহলের সমুদ্র, মালয় সাগর, আশোক সবাইকে ছেড়ে আসতে চায় তার কাছে যে তাকে 'দু দণ্ডের' জন্যে শান্তি দিয়েছিল, সেই 'নাটোরের বনলতা সেনে'র কাছে যে নিজেই সাক্ষাৎ ইতিহাস প্রতিমা – তার চুল 'অন্ধকার বিদিশার নিশা' আর 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'। তাই কবি সব শেষে লেখেন –

'সব পাখি ঘরে আসে – সব নদী, ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'।

এই ইতিহাস চেতনা, যাত্রাপথ সম্পর্কে কবি নিজেই লেখেন—

"মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়-চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো; কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি।"[৬]

"সকলেই কবি না। কেউ কেউ কবি।"[৭]

এই বীজমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন যিনি সমগ্র পাঠককুলকে তিনি হলেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল পাঠকের চিন্তনে পৌঁছানো। কবিতার নিভৃত পাঠ পাঠক হৃদয়ে তৈরি করেছে মুগ্ধতা। তাঁর কবিতায় শব্দ প্রয়োগের নিপুণতা ও চিত্রকল্পের মাধুর্য নির্মিত হয়। বিষন্ন হেমন্তের সন্ধ্যার মতন যার জীবন নদী প্রবাহিত হয়েছে তাঁর কবিতায় জীবন বোধ যে গাঢ় ভাবে ফুটে উঠবে এ তো ভীষণই স্বাভাবিক। তাঁর কবিতার চিত্রকল্প হয়ে ওঠে জীবনের দলিল। এখানে কবির 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি', 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'শিকার', এবং 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত আরও একটি কবিতা 'শব' এর চিত্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা হল।

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর ...
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল – বট – তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিল; ..."

মফঃস্বল থেকে শহরে আসা কবির কবিতায় যে গ্রামবাংলার কথা, তার পরিবেশের কথা উঠে আসবে এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলার প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা, বাংলার পল্লিগ্রামের প্রতি। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' পুরোনো দিনের বাংলার ঐতিহ্যকে স্মরণ করা – চাঁদ সদাগরের প্রসঙ্গ তুলে, বেহুলার প্রসঙ্গ তুলে। এই কবিতায় প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা যায় রয়েছে একটি পাখি, দুটি চরিত্র এবং স্বয়ং কবি নিজে। এছাড়াও শ্যামার গান, ছিন্ন খঞ্জনার নাচের প্রসঙ্গ এসেছে। ডুমুর গাছের 'ছাতা' র মতো বড় পাতার নিচে এক দোয়েল পাখির বসে থাকা কিংবা চাঁদ সওদাগর সমুদ্রে দেখতে পেয়েছিল বাংলার গাছ–গাছালির 'নীল ছায়া'। বেহুলা নদীর চড়ায় 'কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে' তখন 'সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট' দেখেছিল এবং 'শ্যামার নরম গান' শুনে ছিল। সেই বেহুলাকেই পরিস্থিতির চাপে 'ছিন্ন খঞ্জনা' র মতো নাচতে হয়েছিল ইন্দ্রের সভায়। তার পায়ের ঘুঙ্গুরের শব্দে কেঁদে উঠে ছিল 'বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল'। প্রথম ছয় লাইনে কবিকে দর্শক হিসেবে পাওয়া যায়, যিনি সব তা দেখছেন আর পরের দিকে দর্শক 'চাঁদ' – প্রশ্ন উঠতে পারে এ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কোন চাঁদ? কোন বেহুলা–ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁদের তুলে আনা হয়েছে। যেহেতু এখানে আলোচনার মূল বিষয় চিত্রকল্প তাই পল্লি বাংলার প্রকৃতি-ই হয়ে উঠেছে এর মূল বিষয়।

ভোরের দোয়েলকে গাছের পাতার মধ্যে বসে থাকতে দেখা যায় কিন্তু কবি এখানে 'ছাতা' শব্দটি ব্যবহার করে এর গভীরতা কে আরও বৃদ্ধি করেছেন। 'ছাতা' এখানে আশ্রয়, যে আশ্রয়ের নিচে নিশ্চিন্তে বসা যায় আবার মঙ্গল কাব্যের মনসামঙ্গল থেকে চাঁদ সওদাগর, বেহুলার প্রসঙ্গকে তুলে এনে বাঙালির অতি পরিচিত চরিত্রদের স্থান দিয়েছেন। তারা চিত্রকল্পের সঙ্গে মিশে গিয়ে হয়ে উঠেছে বাস্তব। চাঁদ সওদাগর মধুকর ডিঙা নিয়ে সমুদ্র যাত্রা করলেও হিজল–তাল–তমালের নীল বন দেখেছেন, নাকি এ কবির মনের মাধুরি মেশানো তা স্পষ্ট হয় না কিন্তু পাঠকের কাছে তাল–তমাল বনের একটি চিত্র ফুটে ওঠে। বঙ্গ-প্রকৃতির রূপের বর্ণনাতে রোমান্টিক চেতনাও যে উজ্জীবিত হয় পাঠক মনে সে কথাও বলা যায়। পৃথিবীর রূপ খুঁজে খুঁজে অবশেষে যিনি পরিতৃপ্ত হতে চান বাংলার মুখ দেখে, সেই কবির চোখে সমুদ্রে ধরা পড়ে বাংলার পত্রপল্লবের নীল ছায়া। বেহুলার মধ্যে ফুটে উঠেছে বাঙালি গৃহবধূর চিত্র; স্বভাবে, নিষ্ঠায়, পতিব্রতা ধর্মে যে বাঙালি মননকে ছুঁয়ে যায়। বেহুলা গাঙুড়ের জলে ভেলা ভাসিয়ে স্বর্গে গিয়েছিল, মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলার অভিপ্রায় নিয়ে। বেহুলা যদি এই কবিতার নায়িকা হয় তাহলে তাকে নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে গড়ে তুলেছেন কবি। তার যন্ত্রণা, দুঃখ, স্বামীর প্রাণ ফেরানোর জন্যে দেবসভায় নাচ – এই সবটায় ছুঁয়ে যায় বাঙালি পাঠকের হৃদয়। খঞ্জনা, যে মুক্তির প্রতীক তার ডানা কেটে নেওয়ার সঙ্গে, ছিন্ন খঞ্জনার সঙ্গে বেহুলার যন্ত্রণাকে কবি একাত্ম করেছেন, বাংলার নদী নালা মাঠ ভাঁট ফুল ও যে মর্মাহত তার প্রসঙ্গও তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন চিত্রকল্পের মধ্যে।

কবি ছবির পরে ছবি এঁকেছেন। বাংলার রূপ যে অপরূপ সেই অপরূপ রূপের বিস্ময় ফুটে উঠেছে এবং সঙ্গে রয়েছে মুগ্ধতা। কবিতার অনেকটা জুড়ে অন্ধকার–ছায়াচ্ছন্নতা রয়েছে। ভোরের আবছা অন্ধকারের কথা দোয়েল পাখির প্রসঙ্গে কিছুটা বোঝা যায়। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গেই 'পল্লবের স্তূপে' – শুধু ভোর – রাত মেশানো রঙে আঁকা আবার জাম বট কাঁঠাল হিজল অশ্বত্থ এর প্রসঙ্গ আছে। যাদের রঙ একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার। শটি বনের ছায়া এসে মিশে সমুদ্রে, নীল ছায়া রয়েছে – রঙ হালকা কালো এবং কোমলতাময়। চিত্রকল্পের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে ভাবে শব্দগুলি বিন্যস্ত তাতে নদীর চড়া কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্নায় কখনও উজ্জ্বল ছিল, তবে বর্তমানে তা মৃত – এ এক অদ্ভুত আবেদন সৃষ্টি করে। মরে যাওয়া জ্যোৎস্নায় অন্ধকারে 'সোনালি' ধানের উজ্জ্বল চমক এবং তারপরেই 'অসংখ্য অশ্বত্থ বটে'র আরণ্যক গহনতা। সোনালি রঙ কি আশার স্বপ্ন? গহন বন কি দৃঢ় সীমাহীন বাধার প্রাচীর? ছবির মেজাজ আর কোমল নেই – অন্ধকারে জ্বলে উঠেছে 'জ্যোৎস্না' আর 'সোনালি' শব্দ দুটি। কবিতার ভাষাচিত্রগুলি বোধগম্য এবং কবিতার ভাব প্রকাশে চিত্রকল্পের প্রয়োগ যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই কবিতার চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে বাঙালি আবেগের দলিল। এখানে গাঙুড়ের স্রোত বয়ে আনে বাংলার গ্রামীণ জীবনের ঐতিহ্যকে যেখানে বারে বারে উঠে আসে বেহুলার মতন নারীর অসহয়তার কাঁদন।

একটা ভোর এবং একটা রাতের দৃশ্যকে একটার পর একটা করে রেখে সাজিয়ে তোলা হয়েছে 'শিকার' কবিতার অবয়ব। কবিতার প্রথম অংশে একটি গ্রামের ছবি এঁকেছেন যার প্রকৃতির চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে চমৎকৃত। কবি ভোরের আকাশকে যেভাবে তুলনা করেছেন 'ঘাসফড়িঙের দেহের মতন কোমল নীল' এবং চারিপাশের সবুজের বিশেষণ হিসেবে, পেয়ারা ও নোনার গাছ কতটা সবুজ তা বোঝানোর জন্যে 'টিয়ার পালকের মতো' শব্দবন্ধের ব্যবহার করেছেন। এসেছে পাড়াগাঁর গ্রাম্য কিশোরীর কথা। শীতের রাতের যে চিত্রকল্প কবি অঙ্কন করেছেন তাতে শরীরের উষ্ণতা বাড়ানোর জন্যে যে আগুন জ্বালিয়েছেন গ্রামের মানুষেরা তার লাল রঙকে 'মোরগফুলের' মতন বলে তুলনা করেছেন। উপমাতে অভিনবত্ব যা চিত্রকল্পের ভিতকে মজবুত করে তুলেছে।

> "সূর্যের আলোয় তার রঙ কুসুমের মতো নেই আর;
> হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইছার মতো।"

উপমা প্রয়োগের অভিনবত্ব চিত্রকল্পকে যে মাধুর্য দান করেছে তা বোঝা যায় দেশোয়ালীদের মনের ভিতর জ্বলে থাকা নিভন্ত আগুনকে রোগা শালিকের বিবর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে তুলনা করার মধ্যে, যার রং পরেরদিন সূর্যের আলোয় আর কুসুমের মতো নেই। কবি এখানে এক হরিণের জীবনে দেখিয়েছেন, যেখানে শীতের রাতে হরিণ বাঘের থাবা থেকে নিজের প্রাণকে বাঁচাতে পারলেও সভ্য-শিক্ষিত মানুষের লোভের হাত থেকে নিজের প্রাণকে বাঁচাতে পারেনি। আসলে জঙ্গলের প্রত্যক্ষ শত্রুর কথা হরিণ জানে তাই শৈশব থেকেই বাঁচার কৌশল তার রপ্ত কিছু গুপ্ত শত্রুর তীক্ষ্ণ, ধূর্ত চাতুরী কৌশল সম্পর্কে হরিণের জ্ঞান ছিল না তাই মৃত্যু হয়ে ওঠে অনিবার্য। হরিণের মৃত্যু। শহুরে শিক্ষিত মানুষেরা গ্রামে গিয়ে হিংস্র লালসার উল্লাসের চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে কবিতার দ্বিতীয় অংশে। যেখানে কবিতার শুরুতে গ্রামবাসীদের হিমের রাতে নিজেদের শরীর গরম রাখার জন্যে জ্বালানো আগুনের লাল রঙকে মোরগ ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন আবার পরেরদিন সকালে নদীর জল হরিণের রক্তে লাল হয়ে ওঠাকে মচকাফুলের পাপড়ির সঙ্গে তুলনা করেছেন – রঙের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে চিত্রকল্পের ভিতর ফুটে উঠেছে ইমপ্রেশানিজমের ছাপ। শহুরে মানুষের নির্লজ্জ উল্লাস, উচ্ছ্বাস এবং উন্মাদ-উদ্দাম মত্ততা তা বুঝিয়ে দিয়েছে কবিতার শেষ তিন পংক্তি। এই শেষ তিন পঙক্তি তে যে চিত্রকল্প তৈরি হয়েছে তাতে ঘটেছে উল্লম্ফন রীতির প্রয়োগ –

> "সিগারেটের ধোঁয়া;
> টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা;
> এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক – হিম – নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।"

'শব' কবিতায় উঠে এসেছে একটু অপরিচিত অন্য ছবি। প্রকৃতিরই রূপ কিন্তু কোথাও কোনো বিরূপতা নেই। এমন একটা জায়গা যেখানে রুপালি জ্যোৎস্না শরের ভিতর ভেজে। কিন্তু সেই জায়গার চিত্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি অন্য ভূমিকা পালন করেছেন-মশারা শরের ভিতর নিজেদের ঘর বানিয়েছে, যা অন্যরকমের ছবিকে তুলে ধরে। স্থানটিতে রুপালি চাঁদের আলোয় জলে শরবনে যে খেলা তার সঙ্গে মশার আড্ডাকে মেশাতে কবির রূপ চিত্রকল্প কল্পনার ক্ষেত্রে বাধেনি। শব্দ দিয়ে নিজের ক্যানভাসে তিনি চাঁদের আলোয় জলে শরবনের যে খেলা আর তার সঙ্গে মশাকে মিলিয়ে দিয়ে চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। আবার এসেছে সেইসব 'নীল' মশাদের প্রসঙ্গ, রুপালি জ্যোৎস্না আর নীল মশা। এই রঙে ডুব দিয়েছেন কবি বিশেষত সেই নীল মশা গুলিকে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে সোনালি মাছের দল। সোনালি মাছ আর রুপালি জ্যোৎস্নার মধ্যে চিত্রকল্পের ঘনঘটা বয়ে চলেছে। মশাকে কবিতায় জায়গা ছাড়তে আপত্তি থাকলেও রঙিন মাছেদের জলক্রীড়াতে কারোর মানসিকতার সমস্যা হয় না। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে কবিতার যে শান্তি তা ভঙ্গ কে করছে? – মশার দল নয়, সোনালি মাছ। তারা শুধু যে সোনালির মধ্যে নীলকে ঘিরে এক বর্ণাঢ্যতা তৈরি করতে চাইছে তাই নয় পরম আকাঙ্ক্ষায় খুঁটে খুঁটে মশা খাচ্ছে মাছেরা।

> "নির্জন মাছের রঙে যেইখানে হয়ে আছে চুপ
> পৃথিবীর একপাশে একাকী নদীর গাঢ় রূপ;"

মাছগুলি নির্জন, নদী একাকী, মাছেদের মৌনের কথা আগেই বলা হয়েছে। 'গাঢ়' শব্দে এই নদীতে এক গাম্ভীর্য ও গভীরতা এসেছে। পৃথিবীর একপাশে যে নদী তা আবার কান্তারের এক পাশেও। পৃথিবীর এক পাশে একটা বড় ও অলৌকিক ভাব আনে, যেন এ বৈতরণী। কবি সম্ভবত 'অন্য' নদীর কথা বলতে আকাশ-নদী কে বলেছেন। যে নদীতে বিকেলে রাঙা মেঘের ছায়া পড়ে এবং সন্ধ্যার রাতে হলদে জ্যোৎস্না মাখামাখি করে সেই রূপের নদীর চিত্রকল্প কবি অঙ্কন করেছেন। আলো অন্ধকার ফুরিয়ে যাবার মধ্যে অপার্থিবতা আছে। এইসব আলো, এইসব অন্ধকার যা চেনা নয়, এবং সে জগৎ ও দুরূহ কল্পনায় স্নায়ুকোষে ভরে নিতে হয়, যেখানে আলো ও অন্ধকার নেই – সেই সময়ে মাছেদের মেঘেদের জ্যোৎস্নার নানা রঙ ধরা পড়ে। এই কবিতা যেমন রঙের তেমনি নীরবতার বর্ণাঢ্য নীরবতা এবং অনন্ত মৃত্যু প্রসঙ্গের চিত্রকল্প নির্মিত হতে দেখা গেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তিন

সাহিত্য থেকে রসদ সংগ্রহ করে যেমন ছবি আঁকা হয়েছে তেমনই চিত্রশিল্প থেকে রসদ গ্রহণ করেছেন সাহিত্যিকেরা। সাহিত্যের একটি বিশেষ সংরূপ হল কবিতা। আর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিতার শরীর নিয়ে নানারকম ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। চিত্রকর যেমন রঙ তুলি দিয়ে ছবির কবিতা লেখেন ঠিক তেমনই কবি ও তাঁর শব্দ বীজের বুননের মধ্য দিয়ে ছবি আঁকেন। এবং সেক্ষেত্রে চিত্রশিল্প এবং শিল্পীর প্রত্যক্ষ প্রভাবও কবিতার উপরে লক্ষ করা যায়।

উনিশশো তিরিশ থেকে উনিশশো সত্তর পর্যন্ত রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের মূল ছবিটির তাৎপর্য বুঝতে ভুল হয়না। এই সময়ের প্রধান কবিদের মধ্যে অন্যতম সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও জীবনানন্দ। বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ কমবেশি এই ধারার অনুবর্তী। মুখ্যত এটা প্রতীকী কবিতার ধারা। অন্য আর একটি ধারার প্রধান কবি বিষ্ণু দে। জীবনানন্দ চেয়েছেন সময়ের সঙ্গে মানুষের অন্তরের মধ্যে চিরকালীন হয়ে থাকতে। বিষ্ণু দে কবিতার মধ্যে প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। প্রতীকী কবি; প্রসঙ্গত ইয়েটসের কথা উঠে আসে, তাঁর চিত্রকল্প গুলিকে ব্যবহার করেন নিজের মতন করে। আধুনিক কবি চিত্রকল্পকে ব্যবহার করেন তাঁর প্রাত্যহিকের প্রতি মুহূর্তের দৃঢ় ও সজাগ সচেতনতার প্রতিচিত্র রূপে। বাংলা কাব্য সাহিত্যে বিষ্ণু দে অনন্য সাধারণ সচেতনতার অধিকারী বলেই তিনি এই যুগের আধুনিক কবি। তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে দেশের এবং বিদেশের চিত্রশিল্পীদের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

বাংলা কবিতায় বিষ্ণু দে বহুবার বহু চিত্রশিল্পীর কথা, আঁকা এবং শিল্পের ধরনকে তুলে ধরেছেন। ভারতীয় বিদেশি প্রায় সব শিল্পীদের কথায় পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। তিনি ইউরোপের ফোবিষ্ট আন্দোলন নিয়ে লিখেছেন তাঁর 'অন্বিষ্ঠ' কাব্যগ্রন্থের কবিতায়। 'ইমপ্রেশানিজম' এর প্রবক্তা পিসারো তাঁর কথাও এসেছে বিষ্ণু দে-র কবিতায়। অঁরি মতিজ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি লিখেছেন 'শ্রাবণ সন্ধ্যার এক মাতিজ আকাশ'। পল সেজান, পাবলো পিকাসো প্রমুখের কথা ও ছবি তাঁকে বারবার স্পর্শ করেছে যার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কবিতায়। যামিনী রায় ছিলেন তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষ। তিনি যামিনী রায়কে নিয়ে প্রবন্ধও লিখেছেন। যামিনী রায় তাঁর 'পূর্ব লেখ', 'সাত ভাই চম্পা', 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' ইত্যাদি বইয়ের প্রচ্ছদও এঁকে দিয়েছিলেন।

চিত্রকলার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে রেনেসাঁর সূচনা পর্ব (১৪০০ থেকে ১৫০০) যুগেই শিল্পীরা প্রথম ছবিতে কাছের ও দূরের সম্পর্ক এবং বিভিন্ন রকমের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার শুরু করেন। রেনেসাঁ যুগের পর থেকে উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত ইউরোপীয় চিত্রকলায় ইম্প্রেসানিস্টদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এ সময়ে ইউরোপীয় চিত্রকলায় একের পর এক নতুন ইজম বা শিল্পধারার অভ্যুদয় শুরু হয়। এ ধারার শিল্পীদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষ মনে করত 'মুক্ত হাওয়ার শিল্পী', যারা চার দেওয়ালের বাইরে মুক্ত হাওয়ার সজীব প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবি আঁকত এবং ছবিতে আলোর খেলা নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তোলার দিকে নজর বেশি দিত।

বিষ্ণু দে-র কবিতা ও পল সেজান : ইমপ্রেশানিজমের পরবর্তী ধারাতেই আসছেন পল সেজান, তাঁকে এই ধারার জনক বলা হয়। তাঁর মতে –

> "ইমপ্রেশানিস্টরা ছবির পোশাকি দিকটা অর্থাৎ বাহ্যাড়ম্বরের উপর বেশি নজর দিচ্ছেন; ছবির গভীরতা, ওজন, অস্থিমজ্জা বা কঙ্কালের কথা ভাবছেন না। কঙ্কাল বা চামড়ার উপর রঙ মাখিয়ে কি হবে? শুধু শূন্যতা ঢাকার চেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু নয়।"[৮]

এতো গেল তত্ত্ব এবং তথ্যের কথা কিন্তু ও তথ্যের বাইরেও আরও ভীষণ জীবন্ত ভাবে শিল্পী সেজান থেকে গেছেন। বাংলা কবির কবিতা তথা বিষ্ণু দে-র কবিতায় স্পষ্টত প্রত্যক্ষ ভাবে উঠে এসেছেন শিল্পী পল সেজান। বিষ্ণু দে তাঁর 'উত্তরে থাকো মৌন' (১৯৭৫ – ১৯৭৬) কাব্যগ্রন্থের কবিতা 'বৃষ্টির পরে বর্ষার ত্রিকূট'টে শিল্পী পল সেজানের শিল্পমাধুর্য এবং স্বয়ং শিল্পীকে নিয়ে এসেছেন। বিষ্ণু দে-র কবিতার মধ্যে যেমন দক্ষিণের মন্দির গাত্রের কাঠিন্য রয়েছে তেমনই রয়েছে রঙের মিশেল। পূর্ব ভারতের শ্রাবণ আকাশের বর্ণনা এঁকেছেন কবি এখানে এবং সেই বর্ণনার চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে শিল্পী সেজানের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হাতে আঁকা প্রিয় পাহাড়ের চিত্র। পূর্ব ভারতের ত্রিকূট পাহাড় এবং তার প্রাচীন পাথরের নানান খোদাই করা চূড়ার প্রসঙ্গ এসেছে, এখানে উঠে এসেছে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি ও ভাস্কর্যের নিদর্শন। শ্রাবণের আকাশ আলো ছায়ায় জমাট বেঁধেছে। আসলে কবি এই কবিতার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি তার ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্য শিল্প চিত্রকলার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। পল সেজানের ছবি এবং স্বয়ং শিল্পীকেই কবি বিষ্ণু দে এই কবিতায় উল্লেখ করেছেন –

> "আগাইয়া তাই ভাবে : পল কিবা দেখতেন?
> আর আঁকতেন কার রূপ শতবার?"

এই কবিতায় যেমন রাম, মহাবীর প্রসঙ্গ এসেছে তেমন ভাবেই শ্রাবণ আকাশে পাহাড়ের কোণায় রঙের যে খেলা তাকেও কবি উল্লেখ করেছেন।

বিষ্ণু দে–র কবিতা ও পাবলো পিকাসো : ১৯০৬ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে ছবির ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে শিল্পী পাবলো পিকাসো এবং জর্জ ব্যাঙ্ক দেন কিউবিজমের ধারণা। আশোক মিত্রের ভাষায়,

> "পিকাসোর মতো বিখ্যাত আধুনিক শিল্পী এখন আর নেই। তাঁর খ্যাতি হল এমন এক শিল্পরীতি প্রবর্তন করে, যা তাঁর আগে কেউ ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙায়নি।"[৯]

পিকাসোর 'দাভিনিঁয়র নারীরা' (১৯০৭) এবং 'গোয়ের্ণিকা' (১৯০৭) বিখ্যাত ছবি। ১৯৪৪ সালে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। কবিতার রসদ এবং বিষয় হয়ে ওঠে তা বিষ্ণু দে-র 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থের 'আমরাও অন্বিষ্ট তাই' কবিতায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে কবি স্বয়ং পাবলো পিকাসোর-ই উল্লেখ করেছেন কবিতার অন্দর মহলে। 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে স্বাধীনতার সমসময়ে এবং কবিতাগুলি সেই সময়ের হওয়ার কারণে তার ছাপ স্পষ্ট ভাবে কবিতার ওপরে রয়েছে। যুদ্ধের পরিবেশ, 'সাইরেনের গান', 'ধমনীতে শালের আবেগ লালমাটি রক্ত বয়', 'শিরস্ত্রাণ' ইত্যাদি গভীর শব্দ যেমন উঠে আসছে তেমনই সেই সময়ের বাংলার প্রকৃতি পরিবেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখছেন –

> "শ্রাবণে সে সাতরঙা আবেগে – আবেগে
> পিকাসোর তুলিতে রেখায় রঙে রঙে রূপান্তর
> রঙের সে – মুক্তি কেবা রোখে"

পরিবেশ পরিস্থিতি এবং মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কোথাও গিয়ে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ত্রিমাত্রিকভাবে পিকাসো যেমন করে নিজের রঙ তুলিকে ব্যবহার করতেন শিল্পসৃষ্টি করতে, কবি বোধহয় এখানে নিজের কবিতার ক্ষেত্রেও সেই ইঙ্গিত-ই দিয়েছেন পিকাসোকে উল্লেখ করে।

এছাড়াও বিষ্ণু দে–র কবিতার ওপর অঁরি মাতিস এর মতন ফোবিষ্ট শিল্পীদেরও প্রভাব রয়েছে। ১৯০৫–এ মাতিস, ব্রাক, ভ্রামিঙ্ক প্রমুখ শিল্পীরা মিলে প্যারিসে একটি চিত্র প্রদর্শনী করেছিলেন তা দেখে সমালোচকরা রেগে গিয়ে তাঁদের নাম দেন 'ফোবস'। এই একটি ফরাসি শব্দ যার অর্থ বন্য জন্তু। ফোবিজমের মূল ভিত্তি ছিল গাঢ় রঙের খেলা। বিন্দু বিন্দু রঙ দিয়ে জমি তৈরি করেছেন তাঁরা, কড়া রঙ এবং তুলির কড়া পোঁচ ছিল ফোবিজমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আর কবি বিষ্ণু দে তাঁর কবিতাতেও স্থান দিয়েছেন ফোবিজমকে। তাঁর 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থের কবিতা 'প্রতীক্ষা' তে যার ছোঁয়া পাওয়া যায়।

চার

বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশ শুধুমাত্র তিরিশের দশকের কবি নন, তিনি যুগকে ছাপিয়ে গিয়েও থেকে গেছেন পাঠকের হৃদয়ে। তাঁর কবিতায় জ্ঞানের, প্রজ্ঞার প্রত্যক্ষ সোচ্চারে ঘোষণা না থাকলেও, তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের কবিতা। তাঁর কবিতায় শব্দ প্রয়োগের দক্ষতা তৈরি করেছে এক অন্য জীবনের ছবি, মানুষ ভাবতে শিখেছে

জীবনকে নিয়ে আরও বেশি করে। কবিতার ছবিকে নিজেদের যাপনে মাখিয়ে ফেলেছে পাঠককুল। ইন্দ্রিয়ঘনত্ব তথা চিত্রধর্ম জীবনানন্দের কবিতাকে আরও বেশি অবয়বত্ব দান করেছে। তাঁর এই বিশেষত্ব কিটস ও প্রিয়্যাফেলাইট কবিদের মনে করিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর উক্তি –

> "ছবি আঁকতে তাঁর নিপুণতা অসাধারণ। তার উপর ছবিগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের ও স্পর্শের ও বটে, বিশেষভাবে গন্ধের ও স্পর্শেরা।"[১০]

জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়তে পড়তে ইমপ্রেশানিস্টদের ছবির কথা মনে পড়তে পারে। যে দৃশ্য শিল্পী আঁকছেন তা যেন তিনি ঝলকে দেখে নিয়ে রং, আলো, ছায়া যেমন ভাবে দেখেন তেমন ভাবেই আঁকতে চান। এই কারণে ছবিগুলির একক ভাবে কোনো প্রকাশ না করলেও, সব মিলিয়ে আবেদন তৈরি করতে সক্ষম হয়। ইমপ্রেশানিস্ট ছবি যেমন কাছ থেকে তেমন কিছু বোঝা না গেলেও দূরে গেলেও দূরে গেলেই তার আদ্যন্ত রূপটি অকস্মাৎ ভেসে ওঠে আর তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় একটা আলো– যা কখনও স্নিগ্ধ, কখনও বিষাদাচ্ছন্ন, জীবনানন্দের কবিতার স্বরূপটিও ঠিক তেমন।

তিরিশের দশকে এসেছে একাধারে যেমন জীবনানন্দকে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনই তাঁর পাশাপাশি আরও একজন সমৃদ্ধ কবি বিষ্ণু দে–র প্রসঙ্গ এসে যায়। রবীন্দ্রনাথ এর ঘরানাকে বাদ দিয়ে যাঁরা লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিষ্ণু দে। তাঁর শিক্ষা, দক্ষতা, মেধার ভাণ্ডার মণিমুক্ত সম্বলিত, ফলত তাঁর কবিতায় প্রজ্ঞার সোচ্চারে প্রকাশ হতে দেখতে পায় পাঠকবর্গ। তাঁর ছবির প্রতি ভালোবাসা এবং আগ্রহ তাঁর কবিতাকে প্রাণ দান করে। তিনি যেহেতু দেশীয় এবং বিদেশি চিত্রশিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তাই তাঁর কবিতায় যেমন তাঁদের প্রভাব লক্ষ করা যায় তেমনই প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁদের প্রসঙ্গকেও লক্ষ করা যায়। বিষ্ণু দে-এর কবিতার ভাষার কাঠিন্য আলাদা করে অঙ্কন অপেক্ষা চিত্রশিল্পীদের অঙ্কিত ছবি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বেশি।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ইমপ্রেশানিজম, স্যুররিয়ালিজম ইত্যাদি এই ইজমগুলোর প্রভাব থাকলেও তাকে পাঠকদেরই আত্মীকরণ করতে হয়, স্পষ্টভাবে তা বোঝা যায় না কিন্তু বিষ্ণু দে–র কবিতা যেহেতু সরাসরিভাবে চিত্রশিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত তাই সেখানে ইমপ্রেশানিজম, ফোবিজম, কিউবিজম ইত্যাদির স্পষ্ট প্রয়োগ এবং শিল্পীদের নামের উল্লেখ দেখা যায়। বিষ্ণু দে-এর কবিতাতে প্রত্যক্ষভাবে প্রজ্ঞা, বুদ্ধিদীপ্ততার সঙ্গে দেশের এবং বিদেশের যে সকল চিত্রশিল্পী ও শিল্পের প্রভাব রয়েছে তাকে নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। কবিতার হৃদস্পন্দন পাঠকবর্গের হৃদয়ের ক্যানভাসে যে ছবি ফুটিয়ে তুলবে সে বিষয়ে আশাবাদী হওয়াই যায়।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'বাংলা কবিতার কালান্তর', "রবীন্দ্রকবিতায় চিত্রকল্প", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, চতুর্থ সংস্করণ মাঘ ১৪২৪, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৫৮

২. তদেব, পৃ. ৫৮

৩. তদেব, পৃ. ৫৯

৪. তদেব, পৃ. ৬০

৫. তদেব, পৃ. ৬০

৬. দাশ, জীবনানন্দ, 'কবিতার কথা', 'কবিতা প্রসঙ্গে', নিউ স্ক্রিপ্ট, এ-১৪, কলেজস্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা ৭০০০০৭, প্রথম প্রকাশ ৬ই ফাল্গুন ১৩৬২, পৃ. ৩৭

৭. দাশ, জীবনানন্দ, 'কবিতার কথা', 'কবিতার কথা', নিউ স্ক্রিপ্ট, এ-১৪, কলেজস্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা ৭০০০০৭, প্রথম প্রকাশ ৬ই ফাল্গুন ১৩৬২, পৃ. ৭

৮. চন্দন, রহমান, আজাদুর, চিত্রকলা: সংবাদ ৩, 'বিশ শতকের সেরা ঘটনা সেরা মানুষ', ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৯৯

৯. চন্দন, রহমান, আজাদুর, চিত্রকলা: সংবাদ ৩, 'বিশ শতকের সেরা ঘটনা সেরা মানুষ', ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯৯
১০. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৫, আগস্ট ১৯৫৮, পৃ. ১২৭